ইতিহাসের ছিন্নপত্র

(অবিভক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও শহীদ নজীর)

উৎসর্গ

গোলামীর কালে ক্ষীণ দীপশিখা জ্বেলে
চিনিয়েছে যে — কারা ছিল দাসত্বের তাবেদার,
বুকের তাজা খুন ঢেলে জালিমের দেয়ালে দেয়ালে
লিখে গেছে যে — এ দেশ আমার, এ মাটি আমার;
সেই তো আমাদের আগামীর রাহবার —
সালাম তোমায়, সালাম হে শহীদ আবরার ॥

শহীদ আবরার ফাহাদ
(১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ - ৭ অক্টোবর ২০১৯)

ইতিহাসের ছিন্নপত্র

(অবিভক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও শহীদ নজীর)

কায় কাউস

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

আরজ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বঙ্গীয় শব্দকোষে সাম্প্রদায়িক শব্দটার অর্থ করেছেন, 'সম্প্রদায় হইতে আগত পরম্পরাপ্রাপ্ত বা সম্প্রদায়-বিশেষের মতালম্বী'। হরিচরণ তার অভিধানটি তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে এবং এটি শান্তি নিকেতন থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে সাম্প্রদায়িক শব্দটাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে নেতিবাচক তেমন কিছু নেই। সাম্প্রদায়িক শব্দের ইংরেজি বিকল্প হচ্ছে Communal। এই শব্দের অর্থ আর সাম্প্রদায়িক শব্দের অর্থের ভেতরে তেমন কোনো বিরোধ নেই। সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগত থাকা, সম্প্রদায়ের জন্য ভালো কাজ করা, সম্প্রদায়ের স্বার্থে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো খারাপ কিছু নয়। এটা বরং মানুষের ভালো গুণই বলা যায়।

এই যে সম্প্রদায়লগ্নতা–যাকে আমরা সাম্প্রদায়িকতা বলছি, সেটি কিন্তু জাতীয়তাবাদেরও একটা বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের ধর্ম-সম্প্রদায়ের রাজনীতিকে কেবল সাম্প্রদায়িক বলা হয়। কিন্তু যে কেউ যুক্তি দেখাতে পারে, জাতীয়তাবাদও একপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া কিছু নয়। পার্থক্য এই যে, এটি সেকুলার ধারায় প্রবাহিত হয়। আদতে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের উত্থান একই জায়গা থেকে। সাম্প্রদায়িকতার সাথে জাতীয়তাবাদের যুগের পথচলা একই সময় থেকে শুরু; অনেকটা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে। এ কারণে কাকে বলব জাতীয়তাবাদ আর কাকে বলব সাম্প্রদায়িকতা, এই নিয়ে বিস্তর বিতর্কও চলে।

ধর্ম-সম্প্রদায় যেমন তাদের বিশ্বাসের কারণে ভেদবুদ্ধির সূচনা করতে পারে, তেমনই জাতীয়তাবাদীরাও একই ঘটনা ঘটাতে পারে। বৃহৎ জাতিরাষ্ট্র যেমন খুদে জাতিরাষ্ট্রকে খুবলে খায়, তেমনই এক ধর্মীয় সম্প্রদায় অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের ওপর ক্ষতিসাধন করতে পারে। আমাদের দেশে নানা রকম ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কারণে এসব নিয়ে ধারণা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন নয়।

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক বয়ানে খুবই অন্যায্যভাবে ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা, ভেদবুদ্ধির কথা প্রচারিত হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ধারায় যে স্বাতন্ত্র্যবোধের, ভেদবুদ্ধির লক্ষণ আছে, সেটা চেপে যাওয়া হয়। আবার ধর্ম-সম্প্রদায়ের কথা আসলে মুসলমানের পক্ষের স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা আলোচিত হয় বেশি এবং এটি যে সব নষ্টের গোড়া, তাও বলতে বাদ রাখা হয় না।

স্বাতন্ত্র্যবোধ সব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। এই বোধ ছাড়া একটি সম্প্রদায় সম্প্রদায় হয়ে উঠতে পারে না। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বলে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের জন্য তা অনুকূল না-ও হতে পারে। সেটা অনেক সময় ঘটনার ফলাফল; ঘটনার মূল বিষয়বস্তু নয়। মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন।

কিন্তু বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাতে এর একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয় এবং এটি যে সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য, তাও এলান করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতা শব্দ দিয়ে ইসলাম ও ইসলাম অনুসারীদের 'অপর' ও 'বিমানবিকরণ' করা হয়। শুধু তা-ই নয়, বিমানবিকরণের জন্য যত রকমের খারাপ শব্দ আছে, তা মুসলমানদের জন্য মজুত করে রাখা হয়।

এই যে মুসলমানদের দাগি বানানোর সংস্কৃতি, এটা ফুলে-ফেপে ওঠে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশরা মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়েছিল। তাই রাজনৈতিক কারণে মুসলমানদের ছোটো করার, হেয় করার তারা এক প্রাচ্যবাদী পরিকল্পনা হাতে নেয়। এই কাজে তারা সহযোগী হিসেবে পায় কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের। এভাবে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় ম্যাক্স মুলার, জেমস টড ও উইলিয়াম মুরের মতো প্রাচ্যবাদী তাত্ত্বিকদের। এরা ইতিহাসের নব ভাষ্য তৈরি করেন এবং মুসলমানদের দাগি ও হিন্দুদের মহিমান্বিত করার তত্ত্ব প্রচার করেন। ম্যাক্স মুলার প্রাচীন আর্য সভ্যতার জয়গান গান। জেমস টড রাজপুত ও শিখদের গৌরবগাথা তৈরি করেন। উইলিয়াম মুর ইসলামের নবিকে কষে গাল দেন। এভাবে কলকাতাকে ঘিরে হিন্দু ঐতিহ্য ও মুসলিম বিদ্বেষভিত্তিক এক জাগরণ তৈরি হয়। এর গালভরা নাম হচ্ছে বাংলার জাগরণ।

এর পরে আমরা দেখতে পাব, এই জাগরণের রথী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও। রবীন্দ্রনাথের কাহিনি ও কাব্যগ্রন্থে জেমস টডের মুসলমানকে অপর বানানোর ইতিহাসের ছাপ যথেষ্ট রয়েছে। পরবর্তীকালে শিবাজী উৎসব কবিতায় তার ছায়া আমরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই। এমনকি আধুনিকালেও প্রগতিশীল বাম শ্যাম বেনেগালের ছবি 'ভারত এক খোঁজ' বা সঞ্জয় লীলা বনশালীর 'পদ্মাবতী' ছবিতে সেই ইসলামকে অপর বানানোর ইতিহাস অলক্ষে এসে দাঁড়ায়।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি একটা জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্য বাংলা ভাষাভাষীদের যেভাবে পৃথক করেছে, তার তুলনা কমই আছে। প্রভাবশালী হিন্দু সাহিত্যিকদের লেখালিখির সূত্রে যে জাতীয়তাবাদ সেদিন তৈরি হলো, সেখানে মুসলমানদের কোনো স্পেস ছিল না। এই স্পেস না দেওয়ার কালচার পরবর্তীকালে কংগ্রেসের রাজনীতির ওপর ভর করে। স্পেস না দেওয়ার কারণেই জিন্নাহর মতো লিবারেল নেতা কংগ্রেস ছেড়ে দেন এবং নিজের মতো করে পথচলা শুরু করেন। ভারত বিভাগ তাই অনিবার্য ছিল। অথচ প্রচলিত ইতিহাসে ভারত বিভাগের জন্য দায়ী করা হয় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতাকে। আজকাল অনেক ইতিহাসের দলিল-দস্তাবেজ উন্মোচিত হয়েছে। এসব থেকে উপসংহার টানা যায়, সেকালে সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতার কারণে সংখ্যালঘুর স্বাতন্ত্র্য চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পরিতাপের বিষয় হলো, কলকাতাকেন্দ্রিক এই হিন্দুত্ববাদী বয়ান যা মুসলমানকে অপর করেছে, সেকালে ক্ষমতার সাথে সম্পর্কের সূত্রে এতখানি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, এর প্রভাব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্নভাবে পড়েছে এবং আমাদের এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণিও তাতে কিছুটা মজেছেন সন্দেহ নেই। এ কারণেই দেখা যায়, পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হওয়ার পরও এখনকার প্রগতিশীল, সেকুলার, বামপন্থি বুদ্ধিজীবীরা নিরন্তর কলকাতায় নির্মিত বয়ানে হাওয়া

দিয়ে চলেছেন। তারা সাম্প্রদায়িকতা মানে ধর্মকে, বিশেষ করে ইসলামকে বোঝেন এবং ইসলাম সম্পর্কে এক ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ণবাদী মানসিকতা লালন করেন।

কায় কাউস এ বইয়ে বাংলাদেশের প্রচলিত সাম্প্রদায়িকতাবিষয়ক চিন্তাভাবনাকে সমস্যায়িত, প্রশ্নবিদ্ধ ও শেষমেশ মোকাবিলা করেছেন। বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়ের সূত্রে সাম্প্রদায়িকতার যে বিভিন্ন মাত্রা আছে, তা তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন উপাত্ত হাজির করে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রচলিত বয়ানে যেমন বলা হয় সাম্প্রদায়িকতা অনেকটা মুসলমানদের একচেটিয়া বিষয়, সেই ভাবনাকে তিনি তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মোকাবিলা করেছেন।

এ বইয়ে আরেকটি আকর্ষণ হচ্ছে ১৯৪০-এর দশকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার শিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম জাতীয়তাবাদী তরুণ নেতা শহীদ নজীর-এর ওপর নিবেদিত সেকালের কবি-লেখকদের লেখালিখির তিনটি সংকলন। বহু দিন ধরে এসব সংকলন চোখের আড়ালে, একপ্রকার বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল, যা তিনি আমাদের সামনে দৃশ্যমান করেছেন। সেকালের রাজনীতি-সংস্কৃতির স্বরূপটি বুঝতে এসব সংকলন অনেকখানি কাজে লাগবে।

সবশেষে আমি কায় কাউসকে মোবারকবাদ জানাই। তিনি তার নিরলস সাধনায় ইতিহাসের অনেক চাপা পড়া জিনিস তুলে এসেছেন। বইপোকার মতো তিনি একজন ইতিহাসপোকা। ইতিহাসের নানা ছেদবিন্দু নিয়ে মালা গাঁথার তিনি একজন দক্ষ মালাকর। এই মালাকরের শ্রম ও সাধনা কামিয়াব হোক, এই মোনাজাত করি।

ফাহমিদ-উর-রহমান

মুখবন্ধ

শহীদ নজীর আহমদ। উপমহাদেশের নিপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার ও স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রগামী বীর শহীদ। ১৯৪৩ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন তিনি। তার সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য তিনি দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তার সেই ঐতিহাসিক আত্মদানকে জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে গেছে পরবর্তী দুই যুগেরও অধিক সময় ধরে।

অতঃপর যখন তার হত্যাকারী পরাজিত ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আবার নতুন উদ্যমে শহীদ নজীরের রক্তস্নাত পুণ্যভূমিতে তাদের চক্রান্তজাল বিস্তার করে নিজেদের তাঁবেদার গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পেরেছে, তখনই ধীরে ধীরে শহীদ নজীরের স্মৃতিকে মুছে ফেলেছে আমাদের মানসপট থেকে। শহীদ নজীর হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে।

শুধু শহীদ নজীরের স্মৃতিকেই নয়–যে স্বপ্ন, যে আদর্শ, যে চেতনা শহীদ নজীরের মতো হাজারো তরুণকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল উপমহাদেশে মুসলিম জাতিসত্তার সার্বভৌম আত্মপ্রকাশের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে–সেই স্বপ্ন, সেই আদর্শ আর সেই চেতনাকেও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার নামে অপরায়ন করে ফেলা হয়েছে। একইসাথে উপমহাদেশের নিপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠীর সার্বভৌম জাতিসত্তা ও আত্মপরিচয় নির্মাণের আন্দোলন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকেও বলি দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির পরিকল্পিত ইতিহাসের যূপকাষ্ঠে। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে শেখানো হয়েছে সেইসব শহীদেরা আমাদের অনুপ্রেরণা নয়, তাদের স্বপ্ন আর আদর্শ আমাদের স্বপ্ন আর আদর্শ নয়, তাদের সংগ্রাম আর ত্যাগ-তিতীক্ষার ইতিহাস আমাদের গৌরবজনক ইতিহাস নয়। ঔপনিবেশিক শাসক আর সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদী যৌথ অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাসকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে বঙ্গভঙ্গবিরোধী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদীদের ইতিহাসের মাধ্যমে। আমাদের জানতে দেওয়া হয়নি আমাদের সংগ্রামের নায়কদের। পরিবর্তে তাদের নায়কদের পূজনীয় করে তোলা হয়েছে গণমানসে।

আজ চব্বিশের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান যখন উৎখাত করেছে আধিপত্যবাদীদের এদেশীয় তাবেদার শক্তিকে, তখন আবার আমরা স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি আমাদের সেই মুছে ফেলা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিস্মৃতি আর বিকৃতির অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার। আমাদের আযাদীর

সংগ্রামের নায়কদেরকে আমাদের নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার। শহীদ নজীরের বিরাশিতম শাহাদাতবার্ষিকী স্মরণে এই প্রকাশনা আমাদের সেই নবলব্ধ স্বাধীনতারই সগৌরব উদযাপন।

আমরা আমাদের চব্বিশের শহীদ আর সংগ্রামীদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে এই শপথে আবদ্ধ যে, আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আর কখনোই আধিপত্যবাদী অপশক্তির দখলে যেতে দেবো না। আমরা আমাদের আত্মপরিচয়ের অহংকারকে আর কখনোই ম্লান হতে দেবো না। আমাদের আযাদীর সংগ্রামের ইতিহাসকে, আমাদের সংগ্রামের নায়কদের আর কখনোই ভুলতে দেবো না, ইনশাআল্লাহ।

শহীদ নজীরের শাহাদাতকে স্মরণ করে আমাদের আযাদীর ইতিহাস বিনির্মাণের যে দৃঢ় যূথবদ্ধ পথচলা আমরা শুরু করেছি, তা যেন প্রজন্মান্তরে চালু থাকে–এই আমাদের স্বপ্ন ও লক্ষ্য।

পরিশেষে, প্রকাশনার এই গুরুদায়িত্ব বহন করায় গার্ডিয়ান প্রকাশনীকে, স্মরণিকার মূল্যবান ভূমিকার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ ফাহমিদ-উর-রহমানকে, হারিয়ে যাওয়া কিছু দুর্লভ পাণ্ডুলিপি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করায় কবি শাহেদ আব্দুর রকীবকে আর শহীদ নজীরের স্মৃতিকে তার শাহাদাতস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-উদ্যমে স্মরণের আয়োজকদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমিন!

কায় কাউস
২৮ জানুয়ারি, ২০২৫

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
স্মৃতিতে স্মরণে শহীদ নজীর ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিস্মৃত কিছু শহীদ নজীর স্মরণিকা ৫৭

তৃতীয় অধ্যায়
ফিরে দেখা : অবিভক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতা .. ১২৭

প্রথম অধ্যায়

স্মৃতিতে স্মরণে শহীদ নজীর

এক.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নজীর আহমদ, শহীদ : চল্লিশের দশকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির সন্ত্রাসের শিকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শহীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম নির্ভীক ছাত্রনেতা। নজীর আহমদ বৃটিশের নাগপাশ মুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলনে ছিলেন বলিষ্ঠ ছাত্র নেতা, 'পাক্ষিক পাকিস্তান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফোরাম ও কর্মকান্ডের নেতৃত্বদানসহ বহু জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমে জড়িত নজীর আহমদ জাতির জন্য অমূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার দায়িত্ব-কর্তব্য সচেতনতা এবং কর্মোদ্দীপনা তাঁহাকে সুধীজনের শ্রদ্ধালাভে ধন্য করিয়াছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : শহীদ নজীর আহমদের জন্ম বাংলা ১৩২৪ সনের চৈত্র মাসে (১৯১৮ সনের এপ্রিল)। ফেনী জিলার দক্ষিণ আলিপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান হইয়াও তিনি বাল্যকাল হইতেই নিষ্ঠা আর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। তাঁহার বংশপরিচয় যতদুর জানা যায় তাহাতে দেখা যায়-তাঁহার পিতৃকূল বিভিন্ন সদগুণাবলীর জন্য স্থানীয়ভাবে পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষা : শহীদ নজীর আহমদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় নিজ গৃহে। স্থানীয় প্রথামত তিনি প্রথমে আরবী ও কুরআন শিক্ষা করেন। অতঃপর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দরিদ্রতার কারণে তাঁহার শিক্ষাজীবন শুরু হয় কষ্টের মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি হাইস্কুলে ভর্তি হন। আর্থিক অনটন আর প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হইয়াও তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৩৭ খৃ. তিনি বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাস করেন। ১৯৩৯ খৃ. ফেনী কলেজ হইতে আই.এ পাস করিয়া তিনি ঢাকা আসেন। ঐ বৎসরই তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৪২ খৃ. তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সম্মান পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৩ খৃ তাঁহার এম. এ পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে নিহত হওয়ায় সেই পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নাই।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড : নজীর আহমদ স্কুল জীবন হইতেই বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে জড়াইয়া পড়েন। স্কুল জীবনে তিনি "দরিদ্র ছাত্র ভান্ডার" প্রতিষ্ঠা করিয়া গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেন। ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি ছাত্র যুব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পান। স্ত্রী শিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেন। বয়সের তুলনায় তাঁহার কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও দায়িত্ব সচেতনতার গভীরতা সমসাময়িক প্রবীণ ব্যক্তিগণকেও বিস্মিত করে। বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাঁহার ডাকে অবলীলায় সাড়া দিতেন। তাঁহার সামাজিক কর্মকান্ড ছিল সম্পূর্ণ মানবতাবোধ ও জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে নিবেদিত। ছেলেবেলাতেই তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট হন। ইসলামী চেতনাবোধ-উৎসারিত নির্মল সংস্কৃত রচনার চিন্তায় তিনি ছিলেন বিভোর। পরাধীন মুসলমানগণকে স্বকীয় চেতনাবোধে উজ্জীবিত করিয়া স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪২ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয় "পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ" নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। নজীর আহমদ প্রথম হইতেই এই দলের ছাত্রকর্মী হিসেবে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি) এবং

সম্পাদক নিযুক্ত হন সৈয়দ আলী আহসান। সংসদ প্রতিষ্ঠার পর ইহার পাক্ষিক মুখপাত্র 'পাকিস্তান' প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব আসিয়া পড়ে নজীরের ঘাড়ে। তিনি অতি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করিয়া তৎকালীন সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের দৃষ্টি কাড়েন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী মাসে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য-সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন। এই অধিবেশন সফল করিতে নজীর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কবি ফররূখ আহমদ, কবি জসীম উদ্দীন, সৈয়দ আলী আহসানসহ সমসাময়িক কবি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে নজীরের ছিল অকৃত্রিম সম্পর্ক। এই অধিবেশনে বাংলাভাষাকে শিক্ষা-সাহিত্যের বাহনরূপে দাবি উত্থাপিত হয় এবং সেই দাবির পেছনে সুধিগণ যুক্তি উপস্থাপন করেন। নজীর আহমদ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়ও ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

রাজনৈতিক তৎপরতা : রাজনীতির সঙ্গে নজীরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর। ১৯৪০ খৃ. গৃহীত লাহোর প্রস্তাব এবং ইতিপূর্বে (১৯৩০) আল্লামা ইকবাল প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে তখন মুসলমানদের মধ্যে গণজোয়ার চলিতেছে। কংগ্রেস বাদে প্রায় সবগুলি আঞ্চলিক দলই মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে। নেতৃবৃন্দ ভারতব্যাপী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া ফিরিতেছেন। জনগণ মিছিল মিটিং, সম্মেলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করিতেছে। এই অবস্থায় নজীরের মতো সচেতন ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চুপ বসিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। নজীর আহমদ ছাত্রজনতার মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের মর্মকথা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছুটিয়া বেড়ান। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হাবিবুল্লাহ বাহারসহ অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন। নজীর এই সম্মেলনে বিরাট ছাত্র কাফেলাকে নিয়া উপস্থিত হন। ইহা ছাড়া হাবীবুল্লাহ বাহার লিখিত 'পাকিস্তান' গ্রন্থটি তিনি ছাত্র-জনতার মধ্যে ব্যাপকভাবে বিক্রির উদ্যেগ নেন। এইভাবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন।

ছাত্র রাজনীতি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াই নজীর বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পান। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রশ্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা ও সারা প্রদেশের ছাত্রগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালান। আশ্চর্যের বিষয়, নজীর কোন বিশেষ দলের সদস্য বা নেতা না হইয়াও ছাত্রাঙ্গণে যে প্রভাব বিস্তার করেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভারই স্বাক্ষর মিলে। হিন্দু ছাত্রদের সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নজীর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলিম ছাত্রগণ সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের সঠিক নেতৃত্ব নজীরের উপর প্রদান করে। হিন্দু ছাত্ররা তাঁহার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের তৎপরতার প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য নজীর আহমদকে হত্যা করে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজীর আহমদ : ১৯৩৭ খৃ. প্রাদেশিক নির্বাচনে বিভিন্ন প্রদেশে সরকার গঠনকারী কংগ্রেসীরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষাঙ্গনে বন্দে মাতরম সঙ্গীত গাহিতে বাধ্যতামূলক করে । অথচ একই সময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার সব ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই প্রেক্ষাপটে নজীর আহমদ কলেজ জীবনেই বন্দেমাতরম সঙ্গীতসহ কংগ্রেসী সরকারসমূহের সাম্প্রদায়িক তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে থাকেন। ১৯৪০খৃ. লাহোর প্রস্তাব পাস এবং পাকিস্তান আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে হিন্দু ছাত্ররা

ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। ফলে, তাহারা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাহাদের সাম্প্রদায়িকতার চরম প্রকাশ ঘটে ১৯৪৩ খৃ. অনুষ্ঠিত একটি ছাত্রী সমাবেশকে কেন্দ্র করিয়া। এই সমাবেশে হিন্দু মেয়েরা হিন্দু সংস্কৃতির আলোকে সভামঞ্চ ও সভাস্থানটি সাজায়। তাহা ছাড়া মুসলমান ছাত্রীগণকেও ইহাতে অংশগ্রহণে চাপ দেওয়া হয়। অবশেষে পরদিন ২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রী সমাবেশের এহেন সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে নজীর আহমদের নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্ররা মিছিল করিতে থাকে। হঠাৎ হিন্দু ছাত্ররা তাহাদের পালটা মিছিল হইতে আক্রমণ করিয়া নজীর আহমদকে ছুরিকাহত করে। তাঁহাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি মারা যান।

শহীদ নজীর নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতীয়তাবোধে উৎসর্গীকৃত। তাই যখনই ইসলামের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে ডাক আসিয়াছে তখনই তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন জনতার মাঝে। নেতৃত্বের প্রতি তাঁহার কোন লোভ ছিল না, এমনকি তিনি ঘোষিত কোন নেতাও ছিলেন না, তবু তাঁহার নেতৃত্ব বয়স ভেদে কেহই অস্বীকার করিতে পারিত না। ইহাতেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের এবং আদর্শের প্রতি তাঁহার উৎসর্গের মাপকাঠি নিরূপিত হয়।”[1]

দুই.

স্মৃতি পটে শহীদ নজীর/পল্লীকবি জসীম উদ্দীন

“... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকরী পাইয়া কাজে যোগ দিয়াই মুসলিম হলের নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়। গোটা দশ পনেরো ছেলে রাত্রে লেখাপড়া করিতে আসে। অধিকাংশ ছাত্রই মুসলিম হলের আশে-পাশের কুলী-মজুরদের ছেলেরা। কেহ অল্পবয়স্ক, কাহারও বয়স বেশী। মুসলিম হলের ছাত্রেরা পালা করিয়া এক একজন এক একদিন তাহাদিগকে পড়াইতে আসে। একজন ছাত্র এইসব জনসেবার কাজের জন্য সম্পাদক নিযুক্ত হয়।

পরের বছর মুসলিম হলের এই নাইট স্কুলে যাইয়া দেখিলাম ছাত্র-সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাট এ দাঁড়াইয়াছে। অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম নজীর নামক একটি ছাত্রের চেষ্টায় নাইট স্কুলের এই উন্নতি হইয়াছে। আমি নজীরের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য সেদিনকার ছাত্র-শিক্ষকের কাছে আগ্রহ জানাইলাম। তাহাকে বারবার বলিয়া দিলাম নজীর যেন অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করে; কিন্তু নজীর আমার সহিত দেখা করিতে আসিল না। ছাত্রদের অনেক কাজে-কর্মে নজীরের কথা শুনি। নজীরের এই মত, সুতরাং এরূপ করা হইবে না, নজীর এইরূপ বলিয়াছে সুতরাং ওখানে যাইতে হইবে ইত্যাদি।

একদিন আমার এক বন্ধুর বাড়িতে মুসলিম হলের তিন চারিটি পরিচিত ছাত্র আসিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের নাম ধরিয়া আলাপ আলোচনায় কে নজীর চিনিতে পারিলাম। রঙ কালো তামাটে, পাতলা গঠন কিন্তু শরীরের স্বাস্থ্য ভাল। মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে। এই নজীর ইউনিভারসিটিতে, মুসলিম হলে তাহাকে কতবার দেখিয়াছি। কিন্তু কোনদিনও তাহাকে একটা

[1] ইসলামী বিশ্বকোষ (১৩শ খন্ড)/ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ – ডিসেম্বর, ১৯৯২/পৃঃ ৬১৭-৬১৮

কেউকেটা বলিয়া মনে হয় নাই। নজীরকে ডাকিয়া বলিলাম : 'দেখ, মুসলিম হলের নাইট স্কুলে তোমার কাজ দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। আমি তোমাকে একটা পুরষ্কার দিতে চাই।'

নজীর একটু লজ্জিত হাসিল। আমি বলিলাম: 'আচ্ছা বাড়িতে তোমার অবস্থা কেমন?' নাজীর বলিল : 'স্যার। আমার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। সবগুলি পাঠ্যবই এখনও কিনিতে পারি নাই।' আমি বলিলাম : 'আচ্ছা তবে চার-পাঁচ টাকার মধ্যে আমি তোমাকে একখানা পাঠ্য-বই কিনিয়া দিব। তুমি যে কোন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করিও।' পাঠক মনে রাখিবেন সেটা ১৯৪১ সন। আমি মাত্র ১২৫ টাকা বেতন পাইতাম। নজীর অল্প একটু হাসিল। ইহার পরে টাকা লইবার জন্য নজীর আর কোনদিন আসে নাই। আমিও গরজ করিয়া তাহাকে কোন টাকা সাধি নাই। তাহার মত ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার সেই ভাগ্য আমার হইল না।

পরে খবর লইয়া জানিয়াছিলাম ব্যক্তিগতভাবে খুব অভাবও তাহার ছিল না। তাহার এক চাচা তাহার পড়াশুনার খরচ চালাইতেন। সেই টাকার অল্পই নজীর নিজের জন্য ব্যয় করিত। অধিকাংশই গরীব বন্ধু-বান্ধবদের অভাব মিটাইবার কাজে লাগিত।

আমার নিজের দেশ ফরিদপুর। ঢাকা শহর হইতে তিন মাইল দূরে এক বাড়িতে আমাদের দেশের একটি ছাত্র অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেখানে তাহার সেবা শুশ্রুষার বড়ই অভাব। নজীরকে ডাকিয়া বলিলাম : 'নজীর বল ত কি করা যায়?' নজীর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল : 'স্যার কোন চিন্তা নাই। মুসলিম হল হইতে দুইটি ছাত্র প্রতিদিন তাহাকে সেবা করিতে যাইবে।' পরে জানিয়াছিলাম নজীরের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। নজীর ভাল বক্তৃতা করিতে পারিত না। মুসলিম হলের ছাত্র সংসদের সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কোন পদই সে কোন দিন গ্রহণ করে নাই। কিন্তু এমন একটা কি যেন তাহার মধ্যে ছিল যে জন্য তাহার সমসাময়িক ছাত্রেরা চক্ষু মুদিয়া সে যখন যাহা বলিত তাহা পালন করিত।

ফেণীতে বোমা পড়িতেছে। আমরা ঢাকা বসিয়াই আতঙ্কে অস্থির। ষ্টেশনে নজীরের সঙ্গে দেখা।

'নজীর কোথায় যাইতেছ?' সহাস্যমুখে সালাম করিয়া নজীর উত্তর করিল : 'যাই স্যার, দেখিয়া আসি ওখানকার লোকজনেরা কেমন আছে।'

'বল কি নজীর? তোমার ভয় করে না? শুনিলাম ফেণীতে প্রতিদিনই বোমা পড়িতেছে।'

'সেই জন্যই ত যাইতে হইবে স্যার। ভয় করিয়া কি করিব? মরিতে ত হইবেই। ফেণীর লোকগুলি কি অবস্থায় আছে একবার নিজের চোখে দেখিয়া আসি।'

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সহাস্য মুখে আবার সালাম করিয়া নজীর গাড়িতে উঠিল। দূরে - বহুদূরে গাড়ী চলিয়া গেল, তবু ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মানস-নয়নে দেখিতে পাইলাম - সুদূর ফেণীর শত শত অসহায় নরনারীর ক্রন্দন। আকাশ হইতে শত্রুর বোমা মৃত্যুর মত শেল বর্ষণ করিতেছে। দেশের অস্ত্রবিহীন শত সহস্র নর-নারী-বালক-বৃদ্ধ যে যেখানে পারিতেছে ছুটিয়া পালাইতেছে। আর ঢাকা হইতে সশব্দে রাশি রাশি ধুম্র উদগীরণ করিয়া গাড়ী চলিয়াছে। সেই গাড়ীর একটি কক্ষে নজীর। সে আমাদেরই ছাত্র। কে বলে বাঙ্গালী মুসলিম জাগে নাই? নজীরের মত এমনই হয়তো মুসলিম হলের সবগুলি ছাত্র। মানুষকে মানুষ ভালবাসে। সেই ভালবাসার টানই আজ

নজীরকে ফেণীতে আকর্ষণ করিয়াছে। সেই ভালবাসার আকর্ষণই বোধ হয় আজ তাহাকে এতটা নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছে।

তারপর নজীর বহুদিন আমার বাসায় আসিয়াছে। 'পাকিস্তান' কাগজের জন্য লেখা চাহিয়া আমাকে ব্যস্ত-সমস্ত করিয়া তুলিয়াছে। 'পাকিস্তান' ছাড়া কোন কাগজেই বোধ হয় আমি এরূপ ভাবে নিয়মিত লেখা দেই নাই। তাহা সম্ভব হইয়াছে নজীরের তাগিদের গুণে। আজ পুরাতন কাগজপত্র ঘাটিতে ঘাটিতে এক টুকরা কাগজ চোখে পড়িল। নজীর আমাকে বাসায় পায় নাই। ছোট একটি চিঠি রাখিয়া গিয়াছে। 'পাকিস্তানের ঈদ সংখ্যা বাহির হইবে। স্যার! আপনার লেখা চাই-ই চাই।' আজ নজীর নাই। 'পাকিস্তানের' আরো অনেক বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে, কিন্তু সৌম্যমূরতী নজীর আর লেখা চাহিয়া তাগিদ দিতে আসিবে না। নজীরের সেই একটুকরো ছোট চিঠি খানি চিরদিন আমার বাক্সে থাকিবে।

কার্জন হলে বন্দে মাতরম গান লইয়া হিন্দু মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যে আকস্মিক গন্ডগোল হয় তাহার খবর সকলেই জানেন।

সেদিন ছিল নিখিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের সমাবর্তন উৎসব। এই অনুষ্ঠানে ডঃ হাসান (ভাইস চ্যান্সেলার) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই কতিপয় হিন্দু ছাত্র বন্দেমাতরম গানটি গাহিতে আরম্ভ করে। ইহাতে মুসলমান ছাত্রেরা প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু হিন্দু ছাত্রেরা তাহাতে কর্ণপাত করে না। সঙ্গে সঙ্গে এদলে ওদলে চেয়ার ছুড়াছুড়ি আরম্ভ হয়। তখন যদি ডঃ হাসান সভা ভঙ্গ করিয়া দিতেন সমস্ত ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। কিন্তু তিনি সবেমাত্র ভাইস চ্যান্সলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার সভাপতিত্বে সভা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার বদনাম হইবে তাই তিনি বারবার মুসলিম ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তোমরা চুপ কর। তাহারা চুপ করিলে হিন্দু ছাত্রেরা আবার বন্দেমতরম গানটি গাহিতে আরম্ভ করিল। ইহার পরে চেয়ার ছুড়াছুড়ি হইতে দুইদলে মারামারি আরম্ভ হইল। দুই তিন জন ছাত্র আহত হইল।

তখন ভাইস চ্যান্সেলার সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক তাহাদের প্রিয়তম ছাত্রদিগকে এই আত্মঘাতী দাঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া যার যার মত পালাইয়া গেলেন। ইহার পরে মুসলিম ছাত্রেরা কার্জন হল হইতে বাহিরে আসিয়া হিন্দু ছাত্রদের প্রতি ইট পাটকেল ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। হিন্দু ছাত্রেরাও অনুরূপ মুসলিম ছাত্রদের প্রতি ইট পাটকেল ছুঁড়িতে লাগিল।

তখন আমার মনে হইল যেমন করিয়াই হোক, ছাত্রদের মধ্যে এই দাঙ্গা থামাইতে হইবে। ইহাদের পিতামাতা আমাদের উপরে নির্ভর করিয়াই নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। আজ তাহারা এখানে উপস্থিত থাকিলে কিছুতেই আপন সন্তান সন্ততিদিগকে এই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া যাইতে পারিতেন না। দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে এরূপ দাঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া গেলে আমার ভিতরকার মানবতা অপমানিত হইবে। প্রয়োজন হইলে জীবন দিয়াও আমি এই দাঙ্গা থামাইব। একবার আমি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করি অমনি মুসলিম ছাত্ররা ইট পাটকেল ছুড়িতে আরম্ভ করে। আবার মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে থামাই। হিন্দু ছাত্রেরা আক্রমণ আরম্ভ করে। সেদিন যেন কোন অদৃশ্য শক্তি আমার ভিতরে আছর করিয়াছিল। একবার আমি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে থামাইতে চেষ্টা

করিতেছি এমন সময় একটি হিন্দু ছাত্র, ‘শালা জসীম উদ্দীনকে মার’ বলিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিল। আমি তার সামনে যাইয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইলাম : ‘আমাকে মারিয়া যদি তোমরা এই দাঙ্গা হইতে নিরস্ত হও তবে আমাকে মার।’ ছাত্রটি কেমন যেন নিজ্‌ঝুম হইয়া গেল। আর একবার মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে এরূপ ভাবে আবেদন করিতে গেলে আমাদের ছাত্র বদরুদ্দীন আহম্মদ অধুনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমাকে গাল দিয়া বলিল : ‘জসীম উদ্দীন আসিয়াছে হিন্দুদের গোলাম হইয়া আমাদের কাছে শান্তির কথা বলিতে।’ সুন্দর ইংরেজী উচ্চরসের জন্য এবং অপূর্ব ব্যক্তিত্বের জন্য মনে মনে এই ছাত্রটিকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করিতাম। পরদিন সে রবাহুত ভাবে নিজেই আসিয়া তাহার ইত্যকার ব্যবহারের জন্য আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিল।

প্রায় ঘন্টা দুই এইভাবে দাঙ্গা চলিতে লাগিল। আমি কিছুতেই ছাত্রদিগকে থামাইতে পারিতেছিলাম না। নজীর সেখানে উপস্থিত ছিল না। সন্ধ্যা বেলায় সে কোথা হইতে আসিয়া মুসলিম ছাত্রদের আপন আপন ছাত্রাবাসে ডাকিয়া লইয়া গেল। সাপুড়িয়ার মন্ত্রে যেন তাহারা উদ্যত ফনা নত করিয়া চলিয়া গেল। এই গন্ডগোলে একজন মুসলিম ছাত্র একটু বেশী প্রহৃত হয়। খবর পাওয়া গেল সেই ছাত্রটি ঢাকা হলের (হিন্দু ছাত্রাবাসের) ভিতরে আছে। নজীর একাকি ঢাকা-হলের ভিতরে যাইয়া সেই আহত ছাত্রটিকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। নজীরকে হিন্দু-মুসলিম সকল দলই ভালবাসিত। এই মাত্র যাহারা এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভীষণ দাঙ্গায় মাতিয়াছিল তাহারা নজীরকে এতটুকুও অসম্মান করিল না।

পরদিন খবরের কাগজগুলিতে ছাপা হইল ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের দাঙ্গার সময় ইহার সুযোগ্য ভাইস চ্যান্সেলার ডা: হাসান প্রাণপন চেষ্টা করিয়া ছাত্রদের দাঙ্গা থামান।’ আমার কথা কেহই উল্লেখ করিল না। এমন কি আমার সহকারী শিক্ষকেরাও কেহ আমার এই কার্যের জন্য উচ্চবাচ্য করিলেন না। করিবেনই বা কি করিয়া? তাহারা যে অসহায় ছাত্রদিগকে দাঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

শহীদ নজীরের মৃত্যুর পর আমি এই স্মৃতি কথাটি লিখিয়াছিলাম। কেন জানি না, এই স্মৃতিকথা প্রকাশের ভার যাহাদের উপর পড়িয়াছিল তাহারা উপরের এই অংশটুকু বাদ দিয়াছিলেন। সেবার কক্সবাজারের এক সভায় বক্তৃতা করিতে যাইয়া আমাদের প্রিয় ছাত্র, পরে পাকিস্তান গবর্ণমেন্টের মন্ত্রী আসরাফউদ্দীন সাহেব তাহার ভাষণে কার্জন হলের দাঙ্গায় আমার কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। মনে বিশ্বাস জন্মিল, কোন ভাল কাজ করিলে তাহা প্রচারের অপেক্ষা রাখেনা। একজন না একজন তাহা মনে করিয়া রাখে। ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন নতুন অধ্যাপক হইয়া প্রবেশ করিলাম তখন হিন্দু ছাত্রেরা কত ভাবেই না আমার ক্লাশে উৎপাত করিয়া আমাকে চাকুরী ছাড়া করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহারা আমার কাজের সত্যকার পুরুষ্কার দিল এই কার্জন হলের দাঙ্গার দিনে। এই দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান প্রায় ত্রিশজন ছাত্র যখম হইয়াছিল। আমি যে একজন মুসলমান, দুই দলের মধ্যেই ঘোরাফেরা করিয়া দাঙ্গা থামাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম, আমার গায়ে কিন্তু একটি কাঁটার আচড়ও লাগে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা জীবনে এটি আমার শ্রেষ্ঠ পুরুষ্কার।

প্রথম দিনের দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান কয়েকজন ছাত্র সামান্য আহত হয়। নজীর সারারাত্র জাগিয়া তাহাদের শুশ্রুষা করে। দ্বিতীয় দিনের দাঙ্গার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় দেওয়ান বাজারের মোড়ে

নজীরের সঙ্গে দেখা হইল। নজীর কেবল হাসপাতালের নার্স, ডাক্তার ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছিল : 'স্যার, দেখুন ওরা কত বড় জনসেবার ভার লইয়াছে কিন্তু প্রায় সকলেই হৃদয়হীন। সকালে রোগীদের ঠান্ডা দুধ দিয়াছে। আমি নিজে নার্সকে বকিয়া হিন্দু মুসলমান সকল আহত ছাত্রের জন্যই দুধ আবার গরম করাইয়া দিয়াছি।' বুঝিলাম হাসপাতালের প্রতি অভিযোগে কিছু বাড়াবাড়ি আছে কিন্তু নজীর তাহাদের সমালোচনা করিতেছে নিজের উন্নত হৃদয়ের মাপকাঠি দিয়া। এত অভিযোগ যাহাদের বিরুদ্ধে, হায়রে! তাহাদেরই আশ্রয়ে পরদিনই নজীরকে শেষ নিঃশ্বাস লইতে হইল।

আমি নজীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম : 'নজীর, আর ত কোন গন্ডগোল হইবে না?' 'না স্যার, আর কোন গন্ডগোল হইবে না। তবে দু-একটি খারাপ 'এলিমেন্ট' আছে বটে তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিব।' পরে নজীর আমাকে বলিল : 'স্যার, এখন আমি বড়ই ব্যস্ত রাত্রে একবার হাসপাতালে আসিবেন। আলাপ করা যাইবে।' নজীর চলিয়া গেল। তখন পশ্চিম আকাশে রক্তের লোহিত সাগরে দিবসের শান্ত বেলা সাঁতার ধরিয়াছে। ইহাই নজীরের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। প্রথম দিনের দাঙ্গার পরে ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব যদি কিছুদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ দিয়া দিতেন তবে হয়ত কিছুই হইত না। কিন্তু তিনি সবেমাত্র উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ছুটি দিলে বাহিরে জানাজানি হইয়া তাহার অক্ষমতা প্রমাণিত হইতে পারে। এইজন্য প্রথম দাঙ্গার পর দিনই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার হুকুম দিলেন।

পরের দিন হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আবার দাঙ্গা লাগিল। দাঙ্গা শেষ হইলে খবর পাইলাম নজীর সামান্য রকম আহত হইয়াছে। ইতিমধ্যে হাসপাতাল হইতে একজন আসিয়া বলিল : নজীরের অবস্থা গুরুতর। তাহার শরীরে রক্ত দিবার জন্য কয়েকজন সবল যুবক চাই। এই খবর যে যে ছাত্র শুনিল তাহারা সকলেই নজীরের দেহে রক্ত দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ছয়-সাত জন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া হাসপাতালে আসিলাম। কাহাকেও হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। আমরা খবর পাঠাইলে হাসপাতালের অধ্যক্ষ অসিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : 'আহত ছাত্রেরা কেমন আছে?' তিনি উত্তর করিলেন : 'সকলেরই আঘাত সামান্য। একমাত্র নজীরের অবস্থাই গুরুতর।' একজন জিজ্ঞাসা করিলেন : 'আপনি কি বলিতে চাহেন তাহার অবস্থা আশাহীন?' ডাক্তার বলিলেন : 'I am sorry that his condition is very serious'. ছাত্রদের মধ্যে যাহারা রক্ত দিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়া দিলাম। সাহেব বলিলেন : 'আপনাদিগকে ধন্যবাদ, এখন আর রক্ত দিবার প্রয়োজন নাই। দরকার হইলে আপনাদিগকে খবর পাঠাইব।' তখন দেখিলাম যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত ব্লাড ব্যাঙ্কের গাড়ী হাসপাতালের দরজায় দাঁড়াইয়া। বোধ হয় সেখান হইতেই নজীরের জন্য রক্ত লওয়া হইয়াছিল।

অশ্রু-সজল নয়নে খোদার কাছে মোনাজাত করিতে করিতে আমরা হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গের শিক্ষক বন্ধুরা স্থির করিলেন মুসলিম হলে ও ফজলুল হক হলে নজীরের আরোগ্য কামনা করিয়া দোয়া দরূদ পড়ার ব্যবস্থা করা হইবে। যে এ খবর শুনিল সেই সজল নয়নে আসিয়া মসজিদে জড় হইল। না ডাকিতে দুইটি মসজিদ ভরিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু আগে একজন ডাক্তার বন্ধু খবর লইয়া আসিলেন আমাদের নজীর আর ইহজগতে নাই। এই খবর দাবানলের মত সমস্ত ঢাকা শহরে ছড়াইয়া পড়িল। পথে চলিতে চলিতে পা ভাঙ্গিয়া আসে। চোখের পানি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারি না। পরিচিত সকলেরই আমার অবস্থা।

হাসপাতালে ছুটিয়া আসিলাম। শহরে সান্ধ্য আইন জারী হইয়াছে। মৃতদেহ আজ দেওয়া হইবে না। কালও মৃতদেহ অমাদের হাতে দেওয়া হইবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। নজীরের সহপাঠিও সহকর্মীরা ঘন ঘন চোখের পানি মুছিতেছে। গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সারা রাত ঘুম আসিল না।

নজীর আমার আত্মীয় নয়, পরিজন নয়। দেশের একজন নামকরা নেতাও নয়, যাহার জন্য ঘটা করিয়া সভা ডাকিয়া করুণ রসের বক্তৃতা করা যায়। আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ হইলেও বন্ধুবান্ধব সান্তনা দিতে আসে। গৃহে আনন্দ উৎসব থামিয়া যায়। কিন্তু এ বেদনা যে কি করিয়া সহ্য করা যায় তাহার সন্ধান কে দিবে। গৃহে সকলের স্নানাহার, বিশ্রাম, নিদ্রা সবই সমানে চলিতেছে। কিন্তু সকলের সঙ্গে চলিতে যাইয়া কেবল ঘন ঘন তাল কাটিতেছে। কবিতার খাতা লইয়া লিখিতে চেষ্টা করিলাম। চোখের পানিতে কবিতার লাইনগুলি ভিজিয়া গেল।

পরের দিন সকালবেলা ইউনিভার্সিটিতে আসিয়া খবর পাইলাম আজিমপুর গোরস্থানে নজীরের মৃতদেহ আনা হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই দাফন কার্য শেষ হইবে। তাড়াতাড়ি আজিমপুর গোরস্থানে চলিয়া আসিলাম।

মুসলিম হলের ফজলুল হক হলের যে যে ছাত্র খবর পাইয়াছে তাহারা সকলেই আসিয়াছে। ঢাকার মুসলিম জনসাধারণকে খবর দেওয়া হয় নাই। ধীরে ধীরে নজীরের মৃতদেহ গোছলখানার ধারে লইয়া যাওয়া হইল। তাহাকে গোছল করাইয়া কাফনে সজ্জিত করা হইল। কেহ একটি ফুল লইয়া আসে নাই, একটি লোবান জ্বালাইয়া আনে নাই। এসব চিন্তা করিবার মনের অবস্থাও ছিল না কাহারও। সকলেরই চোখে অজস্র অশ্রুধারা। সকলের সামনে আনিয়া মৃতদেহের মুখমন্ডল উন্মোচন করা হইল। মাথায় একটা আঘাতের চিহ্ন। মুখের চেহারার একটুকুও পরিবর্তন হয় নাই। সেই চির পরিচিত স্বাভাবিক হাসিটি যেন লাগিয়াই আছে। যেন এই মাত্র সে ঘুমাইয়াছে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বাঙ্গালী মুসলমানের উজ্জল ভবিষ্যতের কোন স্বপ্ন দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

তোমরা তাহাকে কেহ ডাক দিও না। তাহার এই সুন্দর স্বপ্নভরা ঘুম ভাঙ্গিয়া দিও না। যদি তাহাকে ভালবাস, তার জন্য যদি কাহারও অন্তর কাঁদে তবে যে কাজ সে আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই, সেই কাজে আপনাকে নিয়োজিত কর। যাহারা নিপীড়িত, পদদলিত, বন্ধুবিহীন, মহাবুভুক্ষায় কঙ্কালসার তাহাদের জন্য কিছু করিতে চেষ্টা কর। নজীরের মত নির্ভীক হইবার শিক্ষা গ্রহণ কর।”[২]

---

[২] জসীম উদ্‌দীন (পল্লীকবি)/স্মৃতির পট [পলাশ প্রকাশনী - নভেম্বর, ১৯৬৮। পৃ: ১৮৪-১৯২]